# ঠাকুর পরিবারের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

## সমরশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

নাম বলেন্দ্র হলেও ঠাকুরবাড়ির বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ওরফে বলু। জন্ম থেকেই দুর্বল। ডাক্তাররা বহু সাধ্য সাধনা করে বাঁচিয়েছিল। পায়ে ত্রুটি নিয়ে বহুদিন পর্যন্ত টেনে টেনে চলতেন। ভুগতেনও খুব।

কিন্তু মানসিক বলে, কাব্য সাহিত্যে, দর্শনে, জ্যোতিষ চর্চায়, স্বদেশপ্রীতিতে, ব্যবসায়িক বৈষয়িক বুদ্ধিতে এবং মানবিক চরিত্রে ইন্দ্রের চেয়েও বলবান।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ সন্তান বীরেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র। কবিগুরুর আদরের ভাইপো বলু। মা প্রফুল্লময়ী হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়ার হরদেব চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা। মাসী নৃপময়ী ছিলেন একাধারে মাসি, সেজো জ্যেঠিমা। সেজো জ্যাঠা হেমেন্দ্রনাথের স্ত্রী।

ছোটবেলায় তার দুর্বলতার কথা ভেবে ঠাকুমা সারদা দেবী বাড়ির সব দাস-দাসীর প্রত্যেককে একটা করে কাঁসার জামবাটি আর তাতে টইটম্বুর সরিষার তেল দান করেছিলেন। ঠাকুরদার চলনভঙ্গি অভিনয় করে দেখাতেন। ঠাকুমা খুব আনন্দ পেতেন।

জন্ম ০৬/১১/১৮৭০। তার জন্মের কিছুদিনের মধ্যে বাবা বীরেন্দ্রনাথ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। অথচ ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন। পাগল হওয়ার আগে পর্যন্ত জমিদারির হিসাবপত্র তিনিই দেখাশোনা করতেন। একটু অন্তর্মুখী ছিলেন। বাবা উন্মাদ, নিজে প্রতিবন্ধী দুর্বল, স্কুলে বাড়ির গাড়িতে অন্যান্য তুতো ভাইদের সঙ্গে যাতায়াতকালে পঙ্গুত্ব সম্পর্কে ঠাট্টা অর্ন্তমুখী করে দিয়েছিল। যদিও ছোট থেকেই কবিগুরু ও মৃণালিনী দেবীর ছায়াসঙ্গী ছিলেন। তাদের অন্যতম স্নেহভাজন। চুপচাপ স্বভাব, ঠাণ্ডা প্রকৃতির জন্য বাড়ির সবার প্রিয়পাত্র ছিলেন।

একাধারে কবি, কাহিনীকার, প্রাবন্ধিক, জ্যোতিষ বিশারদ, স্বদেশপ্রীতি-মনোভাবাপন্ন, উন্নত মানসিক ও মানবিক চেতনার অধিকারী, বিজ্ঞানমনস্ক, ব্যবসায়িক ও বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক।

মায়ের সঙ্গে ১৩ বছর বয়সে একবার শ্রীরামপুরে যাবার কালে নদীতে মাঝিদের

মুখে "আমার খুড়োখুড়ি/ পায় না মুড়ি" গান শুনে প্রথমে তার মনে সাহিত্যের উন্মেষ হয়। ঐ তেরো বছর বয়সেই ঠাকুর বাড়ির শুভানন্দিনী দেবী (মেজো জ্যেঠির) সম্পাদনায় 'বালক' বলে পত্রিকার (১২৯২, ১৮৮৫ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়) তার প্রথম রচনা 'একরাত্রি' ও ফাল্গুন সংখ্যায় প্রথম কবিতা 'সন্ধ্যা' দিয়ে সাহিত্য জগতে পা রাখা শুরু। তারপর আর একদিনের জন্যও থেমে থাকেনি তার সাহিত্য চর্চা ও অনুশীলন। এই লেখালেখির মাধ্যমেই কাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে একটা সখ্যতা গড়ে ওঠে। 'বালক' এক বছর চলে 'ভারতী'র সঙ্গে মিশে যায়। নাম হয় 'বালক ভারতী'। পরে আবার শুধু 'ভারতী'। এরপরে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'সাধনা'। সব জায়গাতেই তার উপস্থিতি। সাধনার চতুর্থ বছরে ১৮৯৪ খ্রিঃ কবিগুরু যখন সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন তখন পত্রিকাটার কার্যাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হল বলুকে।

এসময় তার তিনটে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল—(১) চিত্রকাব্য (১৮৯৪), (২) মাধবিকা (১৮৯৬), (৩) শ্রাবণী (১৮৯৭)। ৫/২/১৮৯৭ তে রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র/গগনেন্দ্র খামখেয়ালী সভারও অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। 'ভারতী'র সম্পাদক হিসাবে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম থাকলেও সব সামলাতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঠাকুরবাড়ির আর একটা পত্রিকা 'অর্চনা'র জন্মলগ্ন থেকেই তিনি এর নিয়মিত লেখক। সাধনায় ৩৬টা লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতী ও বালকে ৬৪টা লেখা বেরিয়েছিল। বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যিকসত্তার প্রায় সবটাই জুড়ে আছে তার প্রবন্ধ। ছোট বড় মিলিয়ে ১৯৪টা প্রবন্ধ আছে। তার মধ্যে কয়েকটার উল্লেখ করব।

১৮৯১ সালের অঘ্রাণ মাসে 'সাধনা' প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় 'ঋতুসংহার' প্রবন্ধ। এই পত্রিকায় প্রকাশিত ৮টা প্রবন্ধ সংকলিত হয়ে পরবর্তীতে চিত্র ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তার শিক্ষার প্রথম পাঠ মায়ের কাছে। ৬ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজ। তারপর হেয়ার স্কুল থেকে ১৮৮৬ তে এন্ট্রান্স।

বিয়ে হয় ১৩০২/১৮৯৫তে ২৬ বৎসর বয়সে। পাত্রীর বয়স তখন ১৩ বৎসর। পাত্রী এলাহাবাদের সামরিক বিভাগের সার্জন ডাক্তার ফকির চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সুশীতলা (বিয়ের পর নাম পাল্টে হয় সাহানা দেবী) যার অর্থ সংগীতের রাগবিশেষ।

বিয়েতে খরচ হয় ২৭৬৭ টাকা ১০ আনা ৯ পাই। ঠাকুরবাড়ির প্রথা অনুযায়ী জাঁকজমক আদৌ নয়। কবিগুরুর বিয়েতে খরচ হয়েছিল ৩২৮০ টাকা।

এই বিয়ে উপলক্ষ্যে কবি তার 'নদী' কাব্যগ্রন্থটা বলেন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করলেন। কবি ঐ বিয়ের দিন উৎসব কবিতাটাও লেখেন।

"মোর অঙ্গে অঙ্গে যেন আজি বসন্ত উদয়/কত পত্র পুষ্পময়
যেন মধুপের খেলা/গুঞ্জরিছে সারা বেলা/হেলাভরে করে খেলা/অলস সময়।

বৌভাতের দিন—প্রস্তর মূর্তি। পরের দিন—নারীর দান। এর দু-চারদিনের মধ্যে 'জীবন দেবতা' ও 'রাত্রে ও প্রভাতে'।

বলেন্দ্রনাথও থেমে থাকলেন না। নতুন জীবনের অভিব্যক্তি নিয়ে তিনিও পদ্য লিখলেন 'মাধবিকা'।

"পঞ্চ ঋতু থাক্ নিয়ে যাহে খুশি যার/মধুমাস থাক প্রিয়ে তোমার আমার
শুধু এই যৌবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস/অনুরাগ রঙ্গে ভরা নিত্য নব আশ।
এই তন্দ্রা, এই স্বপ্ন এই নিশি শেষ/এই মনোমোহকর মদির আবেশ
শুধু এই মুকুলিত আম্রকুঞ্জবন/গন্ধ ভরা দিশাহারা প্রভাত-পবন
শুধু এই পত্রে পত্রে মধুর মর্মর/কুঞ্জে কুঞ্জে মুখরিত সঙ্গীত-নির্ঝর
এই স্বচ্ছ নীলাকাশ, কুলকুল নদী/এই বর্ণ এই গন্ধ গীতি নিরবধি
এই প্রাণ, এই প্রেম এ পূর্ণ পুলক/থাক যতক্ষণ থাকে দিনের আলোক।

এক বছর পর বের হল শ্রাবণী—এখানে তিনি নারী সম্পর্কে অনেক বেশি অভিজ্ঞতা লব্ধ। এরই একটা কবিতা 'চির নব' ঋতু পরে যায় ঋতু; মাস পরে মাস/নিত্য নব নব ভাবে তোমার প্রকাশ/মধুমাস ছিল যবে, তুমি ছিলে মধু/গোপন মর্মের মাঝে অয়ি নববধূ।"

তারপর এক বছরে স্ত্রী সম্পর্কে প্রতিমূর্তি গড়ে উঠলো—তারই প্রতিক্রিয়ায় তিনি লিখলেন 'বধূ'—এখানে নারীকে গৃহলক্ষ্মী বললেন, সংসার যাপনের মধ্যেই তার বাস।

রবীন্দ্রপ্রভাব ঃ তিনি নিজেই তার 'বোলতা' আর 'মধ্যাহ্ন' নামে দুটো প্রবন্ধে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথকে। "আমি সন্ধ্যারও নহি/ উষারও নহি/আমি মধ্যাহ্নের জীব/বৈশাখের প্রখর রবিকিরণে আমার জন্ম (সাহিত্য প্রতিভার)। জন্মাবধি রবির কিরণ পান করিয়া দেহ গঠিত।

যদিও অন্যান্য অনেক সমালোচক যেমন—প্রিয়নাথ সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এদের অভিমত যে তিনি রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত ছিলেন।

কবিগুরু আর বলেন্দ্রনাথের একই নামে দুটো কবিতা আছে (১) মেঘদূত (২) কালিদাসের কাল।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তাঁর রচনার মধ্যে দুটো বিষয় অবতারণা করেছেন (১) সাহিত্য, (২) মানবতা/মানব জীবন।

মানব জীবনের স্বভাব ত্রুটি বিষয়ক তার অনবদ্য প্রবন্ধ হচ্ছে 'কৃতজ্ঞতা'। লোকে যতক্ষণ কারো কাছে সাহায্য না পায় ততক্ষণ তাকে স্বর্গে রেখে দেখে। কিন্তু আশ্রয় পেলে তাহার মহত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ বাড়ে। আশ্রয়দাতার পতনে যদি নিজের কোনো অসুবিধে না হয়, তাহলে অনেকেই বিশেষ আনন্দ লাভ করে।

এর জন্যে ভূতপূর্ব সহায়ককে পদদলিত দেখতে কত তৃপ্তি জাগে তার মনে। আশ্রয় দিয়ে সে ব্যক্তি যেন গরুচোর দায়ে ধরা পড়েছে।

সংসারের নিয়মানুসারে অতিথি সর্বসুখ উপভোগ করেও সামান্য ত্রুটি কল্পনায় অভিশাপ দেবার অধিকারী আর যে ব্যক্তি অতিথির আশ্রয়, অভিশাপ না জুটলেই সে কৃতজ্ঞ।

বলেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা/স্বাজাত্যবোধের পরাকাষ্ঠা—সাধনা পত্রিকাতে প্রকাশিত বারাণসী, কোনারক, খণ্ডগিরি, প্রাচীন উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রবন্ধে সৌন্দর্যের অনুরাগ আর প্রীতি ফুটে উঠেছে।

ঊষা ও সন্ধ্যা প্রবন্ধ দিনের শুরু আর শেষের এক ভাবমূলক রচনা। ঊষা সন্ধ্যার ছোট বোন। সন্ধ্যা ঘরকন্না দেখে/ঊষা খায় দায় হাসে খেলে। সন্ধ্যা ঘরে ফিরে ঊষার মুখে একটা স্নেহের চুমু খায়। প্রত্যহ ঊষা আসবার সময় সন্ধ্যা তার গায়ে মাথায় ছোট ছোট সাদা ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেয়।

সন্ধ্যা গোলাপ ফুল। তার হাসিখানি গোলাপের মতো/ঊষা শিউলি ফুল। গোধূলি ও সন্ধ্যাতেও একই ভাবনা বিধৃত হয়েছে।

গোধূলি পুরাতনের মৃত্যু; সন্ধ্যা নূতন সৃষ্টি/গোধূলি অপেক্ষা সন্ধ্যায় গার্হস্থ্যের বিকাশ হয়েছে। গোধূলিতে বিবাহের ভাব; সন্ধ্যায় বিবাহ হয়ে গেছে। সন্ধ্যার মতো গোধূলি আমাদের সুখ দুঃখ বোঝে না। গোধূলিতে অনেক ভাব আসিয়া জমে, তারা চাপা থেকে যায়। গোধূলিতে ফুল ফুটে ওঠে। সন্ধ্যায় বিকশিত কুসুমের সৌরভ বিকীর্ণ হয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের মতে কবিতার মধ্যে ছন্দের আবশ্যকতা থাকে। বলেন্দ্রের গদ্যেও

সেই ছন্দের ঝঙ্কার শুনতে পাওয়া যায়। বালক বলেন্দ্র যা লিখেছে অনেক বয়োবৃদ্ধের তা থেকে শেখার আছে।

আধুনিক বঙ্গের অধিকাংশ কবির মতো তিনি রবি—প্রতিভায় অভিভূত হননি। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তার অনুরাগের দরুনই তার সাহিত্যে সে প্রভাব পড়েছে। তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভূমিকে রবির আলো দিয়ে চিরপ্রদীপ্ত করেছে আর বলেন্দ্রনাথ চাঁদের জ্যোৎস্নায় বাংলা সাহিত্যে স্নেহসুধা ঢেলেছেন।

ভাষা সাহিত্যবিদ প্রিয়নাথ সেন ঃ বলেন্দ্রনাথের গদ্য কথা বলতে জানে। সব ভাব প্রকাশ করতে পারে। তার অভিধান যেমন বিস্তৃত তার ছন্দও তেমনি সুমধুর। শব্দচয়নে বলেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা—এক একটা কথা এক একটা চিত্র। এমন পূর্ণ প্রাণ পূর্ণ অবয়ব কথা বাংলা গদ্যে কোথাও দেখিনি। এই বিস্তৃত অভিধান, ভাষার অপূর্ব বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছে—সে ভাষা কোথাও নিতান্ত সহজ, সরল, ভদ্র গৃহস্থের গৃহ প্রাঙ্গনের ন্যায় অলঙ্কার-শূন্য কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—কোথাও প্রচ্ছন্ন সরসীর ন্যায় স্বচ্ছ স্নিগ্ধ কোথাও বৃক্ষটিকার ন্যায় বিবিধ ফলপুষ্পাভরণে বিচিত্র। কোথাও নক্ষত্র নিবিড় অনন্ত নৈশ গগনের ন্যায় সমুজ্জ্বল গদ্যের মধ্যেও পদ্যসুলভ ঝঙ্কার তার গদ্যে ব্যতিক্রমতা এনেছে।

**স্বদেশ ভাবনায় ধর্মসংস্কার ঃ** ব্রাহ্ম সমাজের ধারক বাহক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে অবতার বাদ নিয়ে কেশব চন্দ্র সেনের যখনই মতদ্বৈধতা দেখা দেয় সেই সময় দ্বয়োকলহে সমুপস্থিতে তৃতীয়স্য লাভ ভবতি।

দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠা করলেন আর্য সমাজ (৭/৪/১৮৭৫)-এ।

কেশব চন্দ্র সেন ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ। স্বাভাবিকভাবেই আর্য সমাজের প্রতি মহর্ষির এক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। উভয় সমাজের মধ্যে এক সেতু গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি পুত্র ও পৌত্রদের কাজে লাগান।

১৮৬৯—১৮৮৪ পর্যন্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি দুই সমাজের মিলনে বহু চিঠি লেখালেখি প্রচেষ্টা বৈঠক করেছেন।

কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে বলেন্দ্রর কীর্তি অবিস্মরণীয়। তিনি শুধু দুটো সমাজের সেতু বন্ধনেই নয়—সময়ের প্রেক্ষিতে বিদেশি শাসনের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য জাতীয় ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তায় ঐক্য গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে ভারতে ধর্মীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন।

দফায় দফায় বাংলায় আদি ব্রাহ্মসমাজ, কেশব চন্দ্র সেনের ভারতীয় আর্য সমাজ, পাঞ্জাবের আর্য সমাজ, বোম্বাইয়ের প্রার্থনা সমাজ—সব সমাজের সমন্বয় সাধনের জন্য ঐসব সমাজের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেন।

মহর্ষির ইচ্ছামতো ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনে তিনিই এগিয়ে এসেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে একটি বাড়িও নির্মাণ করিয়েছিলেন। এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ই হল আজকের বিশ্বভারতী। এই বিদ্যালয়গৃহটাই আজ বিশ্বভারতীর প্রধান গ্রন্থাগারের আদিভূমি। রবীন্দ্রনাটক বাল্মীকি প্রতিভার প্রথম অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বলু।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের সুর সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তার পরোক্ষ ভূমিকা আছে। শিলাইদহে কবিগুরুর ছায়াসঙ্গী হিসাবে থাকাকালীন স্থানীয় বহু গায়ক ও কবি প্রায়ই আসতেন কবির কাছে। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল 'সুনউল্লাহ'। তার মুখ থেকে গগন হরকরার লালন গীতি 'কোথায় পাবো তারে/আমার মনের মানুষটারে' শুনে ওটা এবং আরও ১২টা গান লিখে রেখেছিলেন। সেই থেকেই পরবর্তীতে হয় 'আমার সোনার বাংলা'।

বহুমুখী প্রতিভার আর একটা দিগন্ত ছিল তার জ্যোতিষচর্চা ঃ তিনি নিয়মিত ঠিকুজী কুষ্ঠি তৈরি করতেন। দ্বারকানাথ থেকে শুরু করে শেষে তার স্ত্রী সাহানার পর্যন্ত জন্মকুণ্ডলী করেছেন। আমরা বিভিন্ন রবীন্দ্র জীবনী বইতে কবিগুরুর যে জন্মকুণ্ডলী দেখতে পাই তা তাঁরই করা।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে অভিলেখ্যাগারে সংরক্ষিত ৩৬৪ নম্বর সম্বলিত পাণ্ডুলিপি থেকে বোঝা যায় তার জ্যোতিষচর্চার প্রতিভা।

ক্রিমিন্যাল মানবতত্ত্ব—যাতে মানুষের দৈহিক গঠন ও ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে অপরাধী চিহ্নিত করা হয়—সে বিষয়েও তাঁর ধ্যানধারণা/পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত ও সুদূর প্রসারী। এব্যাপারে 'কথা' বলে তাঁর এক প্রবন্ধও আছে।

এভাবে বিভিন্ন প্রকারে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধনও করেছেন।

ব্যবসায়িক বুদ্ধি ও সুচিন্তিত ধ্যানধারণা তার সঙ্গে স্বদেশ চেতনা তিনি অর্জন করেছিলেন তাঁর প্রপিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের থেকে।

শিলাইদহতে থাকাকালীন সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যৌথভাবে পাটের ব্যবসা করেন। কাঁচা পাট কিনে গাঁটবন্দী করে কলকাতায় চালান দেওয়া। খুব লাভজনক ব্যবসা। ঐ ব্যবসায় পরবর্তীতে কবিগুরুও যোগ দেন।

তখন গ্রাম বাংলায় ভালো আখের চাষ হত। রেনউইক নামে এক ইংরেজ কোম্পানি আখমাড়াই কলের একচেটিয়া ব্যবসা করত। আখমাড়াই কল ভাড়া খাটিয়ে প্রচুর লাভ করত।

বলেন্দ্রনাথও বিদেশ থেকে মেশিন এনে তার একচেটিয়া কারবারে থাবা বসালেন। এছাড়া চামড়ার ব্যবসায়ে মুন্সী বাজারে খুললেন নতুন ব্যবসা কেন্দ্র।

স্বদেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তার সঙ্গে ব্যবসার মেল বন্ধন করে ১৮৯৬ সালে ৮২ নং হ্যারিসন রোডে খুললেন 'স্বদেশী ভাণ্ডার'—মেয়েদের পায়ের আলতা থেকে শুরু করে জুতো পর্যন্ত সব স্বদেশি মাল জোগাড় করতেন সারা দেশ ঘুরে। ব্যাপারটা সবই পণ্ড হল তাঁর অকাল মৃত্যুতে। তাঁর দেশাত্মবোধক তিনটে গদ্য রচনা আছে (১) আশা (১৮৮৭), (২) প্রণাম (১৮৮৭) (৩) বন্দিনী (১৮৮৭)।

গান ঃ তিনি দুটো ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন।

(১) অসীম রহস্যমাঝে কে তুমি মহিমাময় (সারং ঝাপতাল)

পরিবেশিত হয়েছিল ২৩/১/১৮৮৭ ব্রাহ্মসমাজের ৫৭তম মাঘোৎসবে।

(২) নিশীথ নিদ্রার মাঝে জাগে কার আঁখিতারা পরিবেশিত হয়েছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ২৪/১/১৮৮৮ ৫৮তম মাঘোৎসবে।

**গান সম্বন্ধে ঃ** বিশাল জগতের অন্তরতম প্রদেশ থেকে যে সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হয়ে সমস্ত জগতের প্রাণের মধ্যে শান্তি ছড়ায় যে মহান ছন্দে গ্রথিত হয়ে চন্দ্র, সূর্য গ্রহ, নক্ষত্রেরা নীরবে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে সেই শান্তিময়ী/ছন্দোময়ী ধ্বনির নামগান।

মরমের লুকোনো প্রদেশ থেকে তার উৎপত্তি। শ্মশানের গভীর ছায়ায় তার কায়া ও বিশ্বশান্তির অনন্ত আশ্রয়ে তার বৃদ্ধি।

দূর স্বপনের মত প্রাণের পরে সে একবার যে পদচিহ্নগুলো রেখে যায় এ জন্মে তা আর মোছে না।

ভাবের দুয়ার/ প্রাণের দুয়ার /প্রশস্ত করে রাখলে তবেই গান প্রাণে পৌঁছয়। প্রাণেই গানের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

তার মতে ধর্ম হল যা ধারণ করে। তাই ধর্মকে বলা যায় একটা আধার। কিন্তু সেই ধর্মের ঘড়া আজ দীর্ঘদিনের পুঞ্জিত বিশ্বাস, লোকাচার, নানা ছুঁয়াছুঁত, সেই সংক্রান্ত আচরণবিধিতে উপচে পড়ছে।

বিশ্বাস—অবশ্যই মানবজাতির একটা সুদৃঢ় গুণ কিন্তু এই বিশ্বাস যখন অন্ধ হয়ে যায় তখন তার সাথে মেশে নানা ধরনের অদ্ভুত অহেতুক বেশ কিছু বিশ্বাস। সেই সব বেছে ধর্মের ঘড়াকে বিশুদ্ধ করবার লোক কোথায়। তাঁর উপলব্ধিতে ধর্মের এত বাহুল্যতায় ধর্ম আজ ধর্মের ভারে ভারাক্রান্ত। ধর্মের ঘড়ায় তাই শুধু ধর্ম নয়, এসেছে বেশ কিছু জঞ্জালও। বিশেষ করে হিন্দুধর্মের আধার তো শুধুই জঞ্জালপূর্ণ। একদিকে পুরোনো শাস্ত্রবিধি—নানা মুনির নানা মত। নানা গুরুর নানা জীবন, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নানা সময়ের স্তূপাকার বিধি ও বিধানের দুর্ভেদ্য রহস্য। প্রচলিত লোকাচার হিঁদুয়ানির সহস্র নির্দিষ্ট এবং অনির্দিষ্ট অনুষ্ঠান, খাওয়াপরা, শোওয়া বসা, ওঠানামা, হাঁচিকাশির বিবিধ উপদ্রব, আর এদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার নতুন জ্ঞানালোকে নতুন ভাব, নতুন বিশ্বাস এবং নতুন কর্তব্যের উত্তেজনা। এসবের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্য রক্ষা করা মহা দায়। সব ধর্মের এক সুনির্দিষ্ট সুদৃঢ় ভিত্তি থাকে। মুসলিম ধর্মে আল্লাহ, খ্রিস্টধর্মে যীশু। এই সব ধর্মের মানুষদের ধারণা আল্লাহ বা যীশুই তাদের পরিত্রাতা। কিন্তু হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানেও সুদৃঢ় ভিত্তি আছে তবে একের নয় তেত্রিশ কোটির। এই ভিত্তি এতই সুদৃঢ় যে তেত্রিশ কোটির নাম জানা সাধারণ হিন্দু মানুষের পক্ষে এক দুরূহ ব্যাপার। হিন্দুধর্মের আর এক বিশেষত্ব হলো যে এখানে জ্ঞানে অজ্ঞানে, সত্যি মিথ্যায়, ব্রহ্মে হৃৎপিণ্ডে, দেবতা পিশাচে, প্রেমে-হিংসায় এরকম নির্বিবাদ একাত্মবর্তীতা আর কোথাও দেখা যায় না।

ধর্ম মাত্রই চলে আসে পাপ পুণ্যের ব্যাপার। এই ঠিক বেঠিক, ন্যায় অন্যায়, পাপ-পুণ্য ব্যাপারটাই একটা মনোগত ব্যাপার। মিথ্যে কথা বলা পাপ কিন্তু মিথ্যে বলার প্রসঙ্গ আসে তখনই যখন সত্যিটা বলতে পারা যায় না। কিন্তু সত্যিটা বলতে পারি না কেন সেটা কি ভেবে দেখা হয়? আসলে সত্যটাকে গ্রহণ করার ক্ষমতাই আমাদের নেই। সত্য সবসময়ই অপ্রিয়। তাই সত্যিটা বলতে চাইলেও মুখ থেকে নির্দ্বিধায় বেরিয়ে পড়ে কিছু সাজানো গোছানো মিথ্যে। তাই মিথ্যে কথা বলা পাপ বলার আগে উচিত ছিল মিথ্যে কথা শোনা পাপ। সত্যিই কোনটা ঠিক পাপ আর কোনটা ঠিক পুণ্য তা নির্ধারণ করা জটিলতর এক ব্যাপার। কাউকে হত্যা করা যদি পাপও হয় তবে দেবপূজোতে ছাগবলি, পশুবলি ইত্যাদি বলির উৎসবকে পুণ্য বলা হবে কেন? যে ঈশ্বর আমাদের শাস্ত্রে বলেছেন কাউকে হত্যা করা চরম পাপ সেই ঈশ্বরের সামনে যখন পশুবলি হচ্ছে তিনি তখন অপ্রসন্ন হচ্ছেন। সত্যিই কি তাই! বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। সুতরাং

তর্ক না বাড়িয়ে বলা ভালো যে নিয়ম ব্যাপারটা সত্যিই মনোগত। ঈশ্বরকে via media হিসাবে ব্যবহার করে আমরা খেয়ালখুশিমতো নিয়ম গড়ছি, ভাঙছি আর এইসব কারণেই হিন্দু ধর্মে কি যে অনুমোদিত আর কি যে নিষিদ্ধ তা ঠাহর করা দায়।

অদ্ভুত ব্যাপার—গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ মাংসাশী; পশ্চিমী ব্রাহ্মণের আমিষ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে অনেক ব্রাহ্মণ পলান্ন ভক্ষণ করে, আবার বাংলার শক্তি উপাসক ব্রাহ্মণদেরও পানদোষ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আর হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণদের মধ্যে পলান্ডু ভক্ষণ বা মদ্যপানে সদ্য জাতিনাশ হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই কোনো ঐক্য নেই। স্থানবিশেষ ব্রাহ্মণদের আচার, বিচার, ব্যবহার পাল্টে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণের এক অংশের হাতে জাতি রক্ষা হচ্ছে তো আর এক অংশের হাতে জাতিনাশ হচ্ছে। ব্রাহ্মণ্য একটা জাতি আর একটা জাতির মধ্যে এতো ভেদাভেদ। তাহলে গোটা হিন্দু জাতি তো অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত। তা আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত। যে জাতির এত বিভাজন, যে ধর্মের এতো ধর্মাংশ তাতে ঐক্য থাকে কোথায়?

ব্রাহ্মণ্য বা ঐ ধরনের জাতিভেদ ভিন্ন নানা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আবার নানাবিধ অনুষ্ঠান, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই। এইসব আচার ভেদকে নিতান্ত সামান্য বলে গণ্য করা যায় না। কারণ এইসব আচারভেদ থেকেই পরস্পরের মধ্যে আহার ব্যবহার, আদান-প্রদান সম্পর্কে যত বাধা ও সব ধরনের আত্মীয়তার পথ একেবারে বন্ধ। আর যেখানে আত্মীয়তার পথই খোলা নেই সেখানে জাতিগত ঐক্যের কথা ও পাশাপাশি মানবতার ঐক্য কোনোটাই ভাবা যায় না।

শৈব-বৈষ্ণব দেবতার নামে ছড়া বেঁধে গালি দেয়। বৈষ্ণব খুঁজে খুঁজে শিবের যত অপকর্ম আছে বার করে। শাক্ত শৈবেও কোনো বনিবনা নেই। অথচ তাদের আরাধ্য দেবী ও দেবতা স্বামী স্ত্রী। আবার ছোটখাটো অনেক অজ্ঞাতকুলশীল দেবতা আছে, ভক্তেরা তার স্তুতি রচনা করে তাকে জাগ্রত করে তোলে। Lime light-এ আনে।

মনস্কামনা সিদ্ধির ব্যাপারে 'সত্যপীর'—ইন্দ্র, বায়ু, চন্দ্র, বরুণ থেকে শ্রেষ্ঠ। মনসাদেবী অনায়াসে মহেশ্বরকে লঙ্ঘন, যাকে তাকে দয়া দেখিয়ে ভবপার দেখাতে পারে। এছাড়া ওলা আছে, সন্ন্যাসী ফকিরের দেবত্বপ্রাপ্তি আছে।

এইভাবে ঈশ্বর সৃষ্টি হিন্দুদের এক বিনোদনের মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

আবার অবতার নামে দেবতার অপভ্রংশ মানুষে দেবতার সংযোগরক্ষাকারীরা যে আসছে সে বুদ্ধই হোক আর চৈতন্যই হোক যেই আসুন না কেন চোখের আড়াল হলেই

প্রাণের আড়াল। তাদের শিষ্যরা ধর্ম গণ্ডীবদ্ধ হয়ে গিয়ে উদার প্রেমকে সংকীর্ণ করে তুলছে। তখন শাস্ত্রসম্মত অবতার বুদ্ধকে নাস্তিক বলে গালি দিতে ছাড়া হয় না। তার ভাবকে দেশান্তরিত করতে বিবেকে লাগে না। এভাবে দেবে-মানবে-অবতারে, উপদেবতায় নিরীশ্বরে অপূর্ব সম্মেলন একমাত্র হিন্দুধর্মেই সম্ভব।

এছাড়া মনুষ্য সৃষ্ট কুকুর, বেড়াল, ভূতপ্রেত থেকেও নানারকম অপদেবতার স্থান নেহাত মন্দ নয়।

আবার আমাদের প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে দেবচরিত্র হলো চরিত্রহীনতার আদর্শ এবং নবাবী যথেচ্ছাচারিতাই দেবতাদের ক্ষমতার একমাত্র পরিচয়।

ধর্মের এই বিশৃঙ্খলতায় রাজনৈতিক অনৈক্যও জড়িত। এক রাজা আসে, তার ধর্ম সবাইকার ধর্ম। তার পতনেও নতুন রাজার আগমনে নতুন রাজধর্মের অবতারণা।

এইভাবেই চারিদিক থেকে বহুরূপী ধর্মের আবির্ভাবে ও মিশ্রণে হিন্দুধর্ম প্রকাণ্ড এক জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। যেখানে যেমন সুবিধে পেয়েছে নানারকমের গাছপালা ও আগাছা সমানভাবে গজিয়ে উঠেছে।

বলেন্দ্রনাথ কিন্তু এভাবে ধর্মকে জঙ্গল বলে ধর্মকে খাটো করেননি, বরং তিনি ধর্মকে স্বর্গের রূপ দিতে চেয়েছেন। স্বর্গ আমাদের ধারণায় যেমন অমলিন, নির্মল, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, পরিবেশ, পরিমণ্ডলও আনন্দে ভরা। ধর্মকেও জঞ্জাল সাফ করে পরিচ্ছন্ন, নির্মল আনন্দঘন করতে হবে।

কিন্তু মাত্র ২৯ বছর বয়সে ২০/৮/১৮৯৯ তে তার অকাল প্রয়াণের জন্য ধর্মের ঘড়াকে আর বিশুদ্ধ করা হল না। ধর্মের ঘড়াতে আজ মরচে পড়েছে। পরন্তু অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ হয়ে ধর্মের ধ্বজাধারীরা আজ হানাহানিতে মেতে উঠেছে। নতুন ইতিহাস রচনায় তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তাতে অসহিষ্ণুতার মেঘে আজ পৃথিবী মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেছে। কবে এ মেঘ কাটবে তা আর একটা ইতিহাস রচনা করবে।